তথ্য প্রযুক্তির অভাবিত অগ্রগতি: প্রথাগত গ্রন্থাগার টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ

অধ্যাপক আফজাল রহমান

যুগ যুগ ধরে সভ্যতার অগ্রগতিতে বিপুল অবদান রেখেছে যে-গ্রন্থাগার, আজ সভ্যতার সুফল তথ্য-প্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়নের মুখে সেই গ্রন্থাগার আজ সংকটের মুখে। উন্নত বিশ্বে এই সংকট এসেছে গত এক দশক আগে; তখন থেকেই তারা গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বজায় রাখতে যুগের দাবীর আলোকে গ্রন্থাগারের ধরন ও কার্যপরিধি পরিবর্তন করতে শুরু করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সে-সংকট অর্ধ দশক পরে আমলে নেওয়া শুরু হয়।

আমাদের সবরকম গ্রন্থাগার বিরাণভূমিতে পরিণত হবার প্রেক্ষাপটটি বিবেচনায় আনতে হবে প্রথমে। বাংলাদেশে কেবল পরীক্ষার উচ্চ নম্বরকে মেধা গণ্য করে তাকেই মানবসম্পদ উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি করে নেওয়া হয়েছে। আজ পরীক্ষায় উচ্চ নম্বরখচিত মেধার উচ্চকিত উৎযাপনের ভিড়ে প্রজ্ঞা, মননশীলতা ও সৃজনশীলতার চাহিদা ও উপযোগিতা হারায়। বিরাণ হয়ে যায় জ্ঞানের আলয় গ্রন্থাগার–সেইসঙ্গে মননশীলতা-সৃষ্টিশীলতার সকল অঙ্গন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে এমন এক কঠিন সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।

উন্নততর মূল্যবোধের চর্চা, সামগ্রিক জীবনবোধের প্রেরণাদায়ী গ্রন্থাগার যদি রুগ্ন হয়ে যায় সে-সভ্যতা হয়ে যাবে প্রতিবন্ধী সভ্যতা। যে কারণে তথ্য-প্রযুক্তির অভাবিত অগ্রগতির যুগেও গ্রন্থাগারকে বিরাণ হতে দেয় নি পশ্চিমা বিশ্ব। আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু প্রতিবন্ধী সভ্যতার নানা বিকার আমরা প্রত্যক্ষ করছি জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে, নিদারুণ পীড়িত হচ্ছি; আর তখন আমরা ভাবতে শুরু করছি।

Artificial intelligence ডিভাইসগুলো (স্মার্ট ফোন, ট্যাব, কম্পিউটার, টিভি, ভিডিও গেম কনসল ইত্যাদি) আমাদের জীবনকে অধিগ্রহণ করে বসেছে। ব্যক্তির বস্তুজগতের জন্য নিরুঙ্কুশ মনোযোগ অবশিষ্ট নেই, কেননা ভার্চুয়াল জগৎ ব্যক্তির সকল মনোযোগ দখলে নিয়ে গেছে। প্রায় সব পেশার মানুষ দিন-রাতের বেশিরভাগ সময় AI ডিভাইসের বরাতে ভার্চুয়াল জগতের বাসিন্দা। সামগ্রিক জীবনবোধ বা উন্নততর জীবনের সাধনার ফুরসত নাই কারও। ফলে শ্রেয়বোধ, নৈতিক চেতনা ও উন্নততর জীবন-ভাবনার নিদারুণ সংকটের কালে অমন সকল শুভ বোধের সূতিকাগার গ্রন্থাগার আজ এক পীড়াদায়ক অবহেলার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।

পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে আমাদের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। সে-দায় নিয়ে আমাদের গ্রন্থাগারগুলো কার্যকর রাখার বিষয়ে আমার আলোচনা বিস্তৃত হবে।

প্রথম যে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে চাই তা হলো আমাদের লাইব্রেরিগুলো গড়ে উঠবার প্রধান অঙ্গীকার কী ছিল? সরকারি পর্যায়ে বা সামাজিক বা ব্যক্তি-উদ্যোগে গড়ে তোলা সকল গ্রন্থাগারের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল গণচৈতন্য উন্নয়ন। তার পাশাপাশি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন, বৌদ্ধিক জীবনমান উন্নয়ন এবং সমাজ উন্নয়নেও দায় বহন করে আসছে গ্রন্থাগারগুলো। কোনও পরিস্থিতিতেই গ্রন্থাগার তার চিরায়ত দায় অস্বীকার করতে পারে না। জাতি গঠনের যে-দায় গ্রন্থাগারের তা বজায় রেখে পশ্চিমা বিশ্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকের এই সংকট মোকাবেলা করতে হবে আমাদের। আমরা লক্ষ করব দেশেই কোনো কোনো উদ্যোক্তাগোষ্ঠী প্রচলিত গ্রন্থাগারকে যুগের দাবীতে পরিবর্তিত কাঠামোতে নিয়ে কাজের পরিধি বাড়িয়ে গ্রন্থাগারকে কার্যকর করেছেন। উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করে আধুনিক গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে আমাদের দেশেও। সেখানে বই পড়ার পাশাপাশি সামগ্রিক বিকাশের নানা আয়োজন যুক্ত করা হয়েছে। সারাদেশে এরকম সামাজিক উদ্যোগের বেশ কিছু পাঠাগার সময়ের চাহিদার সঙ্গে কর্মকৌশল পরিবর্তন করে কার্যকর রয়েছে।

দেশেই কার্যকর পাঠাগারগুলো উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যুগ-চাহিদার নিরিখে যে-সকল কর্মসূচি যুক্ত করেছে তা নিম্নরূপ:

১। সাপ্তাহিক স্টাডি-সার্কেল বা পাঠচক্র;
২। জাতীয় দিবস উদযাপনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন;
৩। মাদক, বাল্যবিবাহসহ নানা সামাজিক ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্ঠির বিভিন্ন আয়োজন;
৪। বাৎসরিক বইমেলা আয়োজন;
৫। বই পড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন;
৬। বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার আয়োজন;
৭। সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ;
৮। মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা;
৯। মাসিক ধ্রুপদী চলচিত্র প্রদর্শনী;
১০। রক্তদান ক্যাম্প আয়োজন;
১১। স্থানীয় কোনও উন্নয়ন বা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা সভা;
১২। জাতীয় নেতা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু দিবসে আলোচনার আয়োজন;
১৩। সদস্যদের নির্বাচিত ই-বুক, অডিও-বুক সরবরাহ;
১৪। গবেষণা সহায়ক সেল গঠন।

নীলফামারীর ডোমারের শহীদ ধীরাজ মিজান স্মৃতি পাঠাগার, গফরগাঁওয়ের মুসলেহ উদ্দিন পাঠাগার, ঢাকার দনিয়া পাঠাগার, যশোরের ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরি, লক্ষীপুরের মাস্টার আইয়ুব আলী স্মৃতি গ্রন্থাগার, সিলেটের আরজদ আলী স্মৃতি গ্রন্থাগার, গোপালগঞ্জের

বীণাপানি গ্রন্থাগার, ঢাকার সীমান্ত পাঠাগার, পটুয়াখালীর আলোর ফেরী পাঠাগার, রসুলপুরের গণচৈতন্য উন্নয়ন পাঠাগার, ভূয়াপুরের গ্রাম পাঠাগারসহ বেশ কিছু পাঠাগারে উপর্যুক্ত কর্মসূচিগুলো পালিত হচ্ছে।

একটি দেশের আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার নিরিখেই গড়ে ওঠে সেই দেশের গ্রন্থাগার। তথাপিও জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, প্রাযুক্তিক উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে পিছিয়ে থাকে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপুষ্ট আমাদের এই সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিলেবাসের পাঠ নিশ্চিত করে প্রজন্মকে একাডেমিক শিক্ষাদানের কাজটি করছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দায়িত্বে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বেড়েছে। প্রতিটি জেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলো এখন জেলা শহরের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি এখন সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন, এই বিপুল আয়োজন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার দায়মোচনে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে? তথ্য-প্রযুক্তির অভাবিত উন্নয়নে এই সময়ে প্রচলিত সকল পাঠাগার প্রবল পাঠক-সংকটে পড়েছে। সমাজশক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু পাঠাগার এই সংকট মোকাবেলা করতে ব্যবস্থা নিয়েছে, অনেক পাঠাগার নতুন নতুন কর্মসূচিও যুক্ত করে নিচ্ছে। তাঁরা যুগ-চাহিদা নিরিখে কর্মসূচি বাড়িয়ে পাঠকদের সক্রিয় করেছে নানান পাঠ ও সহপাঠক্রমিক কর্মসূচিতে। গবেষণায় দেখা গেছে, সমাজশক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলো সময়ের প্রয়োজনে বদলে যাচ্ছে তাদের দেশী ও প্রবাসী পৃষ্ঠপোষকদের উন্নত মনোভঙ্গির সুবাদে।

এখন জেলা গণগ্রন্থাগারগুলোর কর্মপরিধি যুগ-চাহিদার নিরিখে বর্ধিত করা সময়ের দাবী হয়ে উঠেছে। সমাজশক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহে যে ১৪টি নতুন চর্চা চালু হয়েছে সেরকম পাঁচটি বিষয় যুক্ত করে হলেও জেলা গ্রন্থাগারগুলো প্রাণবন্ত করার সিদ্ধান্ত নেবার সময় এখন। মনে রাখতে হবে প্রযুক্তি সবার হাতে পৌঁছে গেছে, কিন্তু ব্যবহারকারী সবাই সমঝদার নয় বলে নানা অনাচার ঘটে যাচ্ছে। ফলে এই প্রজন্মকে সামগ্রিক জীবনবোধ ও উন্নত মনোভঙ্গির অধিকারী করতে তাদের পাঠচক্র ও সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে বিকশিত করতে হবে। এই মৌলিক কাজটিতে জেলা গণগ্রন্থাগার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ মানে যে-সমাজের মানুষজন সমঝদার, প্রগতিশীল।

প্রজন্মকে নানা পজিটিভ চর্চায় যুক্ত করে পূর্ণ জীবনবোধে প্রাণিত করা গ্রন্থাগারের চিরায়ত যে-দায় তা আজ নতুন বাস্তবতায় নতুন মাত্রায় বিন্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, সরকারি গণগ্রন্থাগারের কর্মকর্তা প্রয়োজনের তাগিদে কার্যপরিধি নিজের আগ্রহে বাড়াতে পারেন না। কিন্তু কথা হলো, সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলো যেখানে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত সমাজ গড়ার কাজ করছে সমাজশক্তিকে নিয়ে, সেখানে আর দশটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের

চেয়ে গণগ্রন্থাগারকে একটু রিলিফ মুডে রাখা দরকার কিনা তেমনটিও ভাবতে হবে। বোধকরি স্বাধীনতার পর একসময় কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সরকারি-বেসরকারি সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি সক্রিয় ছিল।

আজ যুগের দাবীতে গণগ্রন্থাগারের চিরায়ত দায় বেড়েছে, ফলে নতুন বাস্তবতায় নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ও কর্মকৌশল নিতে প্রস্তুতি থাকতে হবে। জাতীয় জীবনে যেরকম নানা সংকীর্ণ অনাচার দেখে আমরা প্রায়ই পীড়িত হচ্ছি, তা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে আগামী দিন সারা দেশে আমাদের একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ দরকার হবে। এই সাংস্কৃতিক জাগরণে গ্রন্থাগারের ভুমিকা অগ্রগণ্য।

একজন ইউরোপ-প্রবাসীর অর্থায়নে পরিচালিত একটি গ্রন্থাগারে কম্পিউটার স্থাপন করে গ্রন্থাগারকে ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে রেখে সদস্যদেও ই-বুক ও অডিও-বুক দিচ্ছে। অডিও-বুক তৈরিতেও প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সদস্যদের কয়েকজন। কোনো কোনো পাঠাগার বিশেষ অ্যাপ. চালু করে কমিউনিটিকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে নানান বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার পাবলিক পাঠাগার রয়েছে সারা দেশে। নতুন নতুন পাঠাগার তৈরিও হচ্ছে গ্রামে ও শহরে। এখন প্রশ্ন হলো পাঠাগার গড়ে ওঠাই বড় কথা নয়। পাঠাগার পাঠকমুখর থাকা, অনুষ্ঠানমুখর করে রাখাটাই মৌলিক প্রশ্ন।

পাঠাগার আন্দোলনকারীগণ এসব বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত ভাবছেন, কাজ করছেন। সরকারি গণগ্রন্থাগারে এ-সকল আধুনিক সেবা তথা কর্মসূচি চালু করা খুব কঠিন নয়। গণগ্রন্থাগারগুলোর নিজস্ব ছোটো হলরুম রয়েছে, সেখানে সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ধ্রুপদী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর নিয়মিত কর্মসূচি বা আয়োজন রাখা যায়। যেকোনো অনুষ্ঠান করা যায়। সেসব আয়োজনের জন্য প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যয়ের বিধান যুক্ত করাও দরকার মনে করছেন গ্রন্থাগার আন্দোলনকারীদের একটি অংশ। সরকারি গণগ্রন্থারটিকে জেলা শহরের বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসাবে কর্মমুখর দেখতে চান সমাজশক্তি। সেরকম পরিবর্তন সময়ের দাবী।

গণগ্রন্থাগারকে যে-বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:
এক. বিভিন্ন বয়সের পাঠকদের গ্রন্থাগারে যুক্ত করা;
দুই. পাঠকদের চাহিদা ও প্রয়োজন উপলব্ধিতে নেওয়া;
তিন. সময়ের দাবী বিবেচনায় নিয়ে নতুন কর্মসূচি নেওয়া;
চার. তরুণ প্রজন্মের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ;
পাচ. সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ বৃদ্ধি;
ছয়. সমাজের নানা পেশার মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়ানো
সাত. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের মনোভঙ্গি সচল রাখা।

সাম্প্রতিক সময়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের পাঠক নানা জেলায় নানা সৃজনশীল কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে যা খুবই আশাব্যঞ্জক বিষয়। সেসব আয়োজনে পরিবার-প্রধানরা ও সমাজশক্তি উৎসাহ দিচ্ছেন। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে জেলা গণগ্রন্থাগারের কাজের একটি সমন্বয় গড়ে উঠতে পারে। তাতে সমাজশক্তির আস্থা বাড়বে। সমাজে শুভবোধের চর্চা ও অনুশীলন বাড়াতে গণগ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, বেসরকারি গ্রন্থাগার সবাই সক্রিয় হলে সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি অবশ্যই বদলাবে। সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে কখনও এককভাবে, কখনো-বা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। দেশের এই বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারা এক বড় চ্যালেঞ্জ। সর্বোপরি উন্নত সমাজের জন্য আবশ্যক যে-উন্নত মনোভঙ্গির মানুষ, সেই উন্নত রুচি ও বোধের মানুষ তৈরিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা চিরকালীন।

সরকারের অনেক মন্ত্রণালয় এ-বিষয়ে কাজ করছে। এই বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপায়িত করার আর এই চ্যালেঞ্জ মোকবেলায় সরকারি, সামাজিক সকল প্রতিষ্ঠানকেই সর্বোচ্চ সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।